দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 15 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিপর্যস্ত শিক্ষা বন্যা, হরতাল, তারপর ...

শিক্ষা ক্ষেত্রে লাভ-ক্ষতি মূল্যায়নের জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা বাংলাদেশে নেই। উন্নত বিশ্বে শিক্ষার্থীদের কাছে পর্যন্ত জবাবদিহি করা হয়। এ দেশে ছাত্র বা অভিভাবক কেবল আশঙ্কা আর উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারেন; শিক্ষা ক্ষেত্রে নিজের ইতিবাচক মতামত দিতে পারেন না। ১৯৯৮ সাল বাংলাদেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে ভয়াবহ ক্ষতির বছর। বন্যার কারণে বন্ধ ছিল পড়াশোনা; ছাত্র সংঘর্ষ ও অন্যান্য কারণেও বন্ধ ছিল। এখন হরতাল-আন্দোলনের দাপটে বিপর্যস্ত হচ্ছে শিক্ষা। স্কুলের ফাইনাল, বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের পরীক্ষা, উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষাসহ সবকিছু অনিশ্চয়তায় বন্দী। নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে এসে বাংলাদেশের সমগ্র শিক্ষাঙ্গনে, শিশু থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সর্বত্র নেমে এসেছে পশ্চাৎপদতার নগ্ন পদধ্বনি। আমরা জানি না আমাদের শিক্ষা কোন্ অচেনা গন্তব্যের দিকে যাচ্ছে। আর কতদিন চলবে এই ক্ষতিকর প্রয়াস?

ক্যাম্পাস ডায়েরী

মাহফুজ পারভেজ

১৯৯৮ সাল বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশ কিছু ক্ষতির চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। শতাব্দীর দীর্ঘতম ও ভয়াবহ বন্যায় কয়েক মাস বন্ধ ছিল শিক্ষা কার্যক্রম। স্কুল-কলেজ পানিতে তলিয়ে যায়, শিক্ষক-ছাত্ররা ছিল বন্যাতাড়িত। বন্ধ ছিল পাঠ কার্যক্রম।

সামগ্রিক এই ক্ষতির বাইরেও ছিল বিচ্ছিন্ন কিছু বন্ধ। জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অভ্যন্তরীণ ইস্যুভিত্তিক কারণে ও সংঘর্ষে বন্ধ ছিল। দেশে বেশ কিছু কলেজও ছিল উত্তপ্ত। জানমালের ক্ষতির বাইরে শিক্ষা কার্যক্রমের ক্ষতির পরিমাণ সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি। ক্ষতি যে অসামান্য, তা টের পাওয়া যাচ্ছে বছরের শেষে নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে।

কোথায় পাঠাচ্ছি প্রজন্মকে

কয়েক মাসের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা রাত-দিন খেটে পুষিয়ে নিচ্ছিল ক্ষতি। কোথাও কোথাও বন্ধের দিনেও ক্লাস শুরু হয়েছিল। আশা করা হচ্ছিল বছরের মাঝখানের শিক্ষা ক্ষতি চিহ্ন মুছে দেবার। সে প্রত্যাশা এখন পূরণ হবে কি না, কেউ জানে না। দেশব্যাপী হরতাল ও আন্দোলন উত্তাপ ছড়াচ্ছে সর্বত্র। সাধারণ জীবন হয়ে উঠছে ভীতিকর। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে লাখ লাখ শিশু-কিশোর ছাত্র-ছাত্রী। স্কুল-কলেজে যেতে পারছে না তারা। অথচ বছর শেষের বার্ষিক পরীক্ষা দেয়া না গেলে পুরো একটি বছর নষ্ট হবে তাদের শিক্ষাজীবন থেকে। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে যে সেশনজট ছিল, সেটা যদি প্রাথমিক-মাধ্যমিক স্তরে এসে হামলা করে, তাহলে বাংলাদেশের শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত কোথায়? আমরা কি ঘোরতর অনিশ্চয়তার কালো অধ্যায়ে ঠেলে দিতে চাই আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে?

শুরুই হচ্ছে না

লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী অপেক্ষা করছে বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, মেডিক্যালসহ উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেবার জন্য। অন্যান্য বছর এমন সময় ভর্তির সার্কুলার বের হয়ে যায়, শিক্ষার্থীরা উদ্যোগ-আয়োজন নিতে থাকে। এবারের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ভর্তি কার্যক্রমই শুরু হবে সেশনজটকে সঙ্গে নিয়ে। কবে কি হবে কেউ জানে না, তৈরি হতে পারছে না ভর্তিচ্ছুরা। হতাশা ও আলস্যে কাটছে তাদের দিন। তারা পিছিয়ে যাচ্ছে, সরে যাচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম থেকে। অনেকেই বেপথু হচ্ছে। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাড়ছে অভিভাবকদেরও। সবচেয়ে স্পর্শকাতর ও সতর্ক সময়ে তরুণ-তরুণীদের অলস করে রাখার ফলে উচ্চশিক্ষার একটি শুভ সূচনা তারা পাচ্ছে না। এই না দিতে পারার ফলে তরুণ প্রতিভা ও মেধা বিপন্ন হচ্ছে— জাতি হারাচ্ছে আগামী ভবিষ্যতকে।

থেমে গেল জীবন

সম্ভাবনা ছিল বছর শেষে বিসিএস পরীক্ষার কার্যক্রম শুরু হবে। লাখ লাখ বেকার ছাত্র শুরু করার সুযোগ পাবে কর্মজীবন। বেশ ক'বার পিছানোর পরও বিসিএস পরীক্ষার পূর্ণ রুটিন ও পাঠ্যক্রম সামনে নিয়ে শিক্ষার্থী ঠাণ্ডা মাথায় তৈরি হবে— সে অবস্থা নেই। বিসিএসের ছাত্ররা মূলত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর। জাতীয়সহ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দফায় দফায় পিছানো হলো বন্যা ও আন্দোলনের ফলে। সে সব পরীক্ষা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত না হলে শিক্ষার্থীরা বিসিএসে অংশ নেবার যোগ্যতা পাবে না। থমকে গেল জীবনের চাকা। শেষ হচ্ছে না উচ্চশিক্ষা, শুরু হচ্ছে না কর্মজীবন।

কে করবে জবাবদিহি

প্রাকৃতিক কারণে ও আন্দোলনে অকাতরে ক্ষতি হচ্ছে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর। কে দেবে এর হিসাব? কে নেবে দায়িত্ব? কে করবে জবাবদিহি?

সমস্যাটি একক কোন কারণে হলে কথা ছিল। সরকার-বিরোধী দলগত আর্থসামাজিক ও অভ্যন্তরীণ নানা কারণে বিপর্যস্ত হচ্ছে শিক্ষা, পিছিয়ে পড়ছে শিক্ষার্থীরা। জীবনযুদ্ধে যাবার আগেই পরাজিত হচ্ছে তারুণ্য। এমন অবস্থা চলতে থাকলে অচলায়তনের পাষাণ থেকে মুক্তির কোন পথই থাকবে না, থাকবে না পিছিয়ে পড়াকে পুষিয়ে বিশ্বের সমান কাতারে আসা।

শিক্ষাকে নিরাপদ রাখা জরুরী

সকল কিছু থেকে শিক্ষাকে নিরাপদ রাখা এখন খুবই জরুরী হয়ে উঠেছে। নিরাপদে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের কোনভাবে বিব্রত ও ব্যাহত করা বন্ধ করতে হবে। এ দাবি ভিতর ও বাইরে থেকে আসতে হবে। আগে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের ঐকমত্য দরকার যে, সকল অসুবিধা ও প্রতিক্রিয়া থেকে ক্যাম্পাসসমূহকে, শিক্ষায়তনকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে হবে। ছাত্র-শিক্ষকের মূল পেশাগত কাজ 'শিক্ষা'কে সর্বাগ্রে পালন করতে হবে। পাশাপাশি জাতীয় ক্ষেত্রের সকল পক্ষকে (সরকার, বিরোধী দল, প্রশাসন) রাজি করাতে হবে যাতে তাদের কার্যক্রমের উত্তাপ শিক্ষাকে ব্যাপৃত না করে। শিক্ষা মানুষের অধিকার। এ অধিকার আদায় করতে হবে। কারও স্বার্থ সিদ্ধির জন্য জাতির শিক্ষার অধিকার এবং জাতিকে শিক্ষিত করার অধিকারকে বলি দেয়া যায় না।